টোপ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক বহুমাত্রিক প্রতিভা। তিনি একদিকে যেমন কিশোর সাহিত্যের জনপ্রিয় স্রষ্টা, অন্যদিকে তেমনই প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবাস্তব গল্পের দক্ষ রূপকার। তাঁর ছোটগল্পগুলোতে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ এবং সমকালীন সমাজের দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'টোপ' গল্পটি তাঁর সেই ধরনেরই একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প, যেখানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, লোভ, দুর্বলতা ও সামাজিক বাস্তবতার নির্মম রূপ অত্যন্ত সংযত অথচ গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'টোপ' গল্পের শিরোনামই পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। 'টোপ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত খাদ্য বা প্রলোভন। কিন্তু গল্পে এই 'টোপ'কেবল মাছ ধরার উপকরণ নয়; এটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মানুষের লোভ, দুর্বলতা ও প্রলোভনের রূপ হিসেবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় শিরোনামের মাধ্যমেই ইঙ্গিত দেন যে, গল্পের কেন্দ্রে থাকবে এমন এক পরিস্থিতি যেখানে মানুষ নিজেই নিজের দুর্বলতার ফাঁদে পড়ে। গল্পের পটভূমি মূলত একটি সাধারণ শহুরে বা আধা-শহুরে সমাজ। এখানে কোনো অতিরঞ্জিত নাটকীয় ঘটনা নেই, নেই রোমাঞ্চকর মোড়। বরং গল্পের ঘটনাপ্রবাহ খুবই স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি। এই স্বাভাবিকতাই গল্পটিকে বাস্তবধর্মী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। গল্পের চরিত্রগুলোও আমাদের চেনা মানুষ—তারা সমাজের উচ্চবিত্ত নন, আবার একেবারে প্রান্তিকও নন; বরং মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিনিধি।

গল্প আরম্ভ হয়েছে গল্প-কথকের একটি পার্সেল প্রাপ্তি নিয়ে। বাঘের চামড়ার একজোড়া চটি। সঙ্গে কমপ্লিমেন্ট কার্ড এবং তাতে লেখা 'উইথ কমপ্লিমেন্টস্ অব রাজা বাহাদুর এন.আর.চৌধুরী রামগঙ্গা এস্টেট।' কমপ্লিমেন্ট কার্ড দেখেই গল্প কথকের স্মৃতিপটে উদিত হয়েছে আটমাস আগের সেই ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর শিকার কাহিনী। গল্প কথক স্মৃতির সমুদ্র সাঁতরে, সেই অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন বা ফ্ল্যাশ-ব্যাকে উপস্থাপিত। গল্পের প্রথমেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গল্প কথকের সঙ্গে রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাধিরাজের পরিচয় ও যোগাযোগ সূত্রটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মহারাজার প্রশংসা করে কবিতা রচনার জন্যে গল্প কথক তার প্রিয় হয়ে ওঠে এবং একটি মূল্যবান সোনার ঘড়ি উপহার পায়।

পরিচয়ের সূত্র ধরেই আটমাস পূর্বে শিকারে সহযাত্রী হওয়ার জন্যে মহারাজার নিমন্ত্রণ আসে এবং গল্প কথক সেই শিকার পর্বে যোগদান করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন-তা নিয়েই মূল গল্প। এই অংশটি মূল গল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়, অথচ এটুকু না থাকলে গল্প-বৃত্তে প্রবেশ পথটাই রহস্যময় হয়ে ওঠে। সামন্ততন্ত্রের প্রতীক মহারাজার সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উমেদার সুলভ মনোবৃত্তির প্রতীক গল্প কথকের সম্পর্কটি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে এই পর্বে। গল্পের মূলে রাজাবাহাদুরের যে রূপ ফুটে উঠেছে, ভিন্নতর আর একরূপ ফুটে উঠেছে এই পর্বে। মহারাজ প্রশংসাপ্রিয় এবং অনুগ্রহভাজনের প্রতি সহৃদয় ও মুক্ত-হস্ত। প্রশংসার বিনিময়ে অনুগ্রহ-প্রদানের বিষয়টিকে মহারাজ সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনেননি। কবিতা পাঠের পর কথকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মাঝে মাঝেই মহারাজ তাকে চা পানে আপ্যায়িত করেছেন এবং পরে সামান্য এক উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছেন। সমস্ত বিষয়টির মধ্যে মহারাজের বুদ্ধি, সম্ভ্রমবোধ ও হার্দিক-উষ্ণতার পরিচয় মেলে। তাই সূচনা-পর্ব মূল গল্পের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও গল্পের মূল ভাবের প্রবেশের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে।

গল্প কথকের সঙ্গে রাজাবাহাদুরের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ও যথোচিত সম্ভ্রমপূর্ণ ও মর্যাদাসূচক। রাজাবাহাদুর অতিথিকে উষ্ণতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন এবং নিজে চা পর্যন্ত না খেয়ে অতিথির জন্য বারান্দায় অপেক্ষা করেছেন। রিফ্রেসমেন্টের পর কথাবার্তার মধ্যে এসেছে রহস্যময়তার ইঙ্গিত। নীলাভ পাহাড়ের নীচে 'টেরাইনের ওয়ান অব দি ফিয়ার্সেস্ট ফরেস্ট।' রাজাবাহাদুর ওখানে বিশেষ টোপ দিয়ে মাছ ধরেন। গল্প-কথক কিছুই বোঝেনি। রাজকীয় হেঁয়ালী ভেবে প্রশ্নও করেন নি। এরপরেই রাইফেল ছোঁড়ার কথা হয়েছে। গল্প-কথবের ভীতিকে রাজাবাহাদুর উপভোগ করেছেন এবং প্রশ্ন করেছেন 'আচ্ছা বলতে পারেন আপনি রাজা নন কেন?' এরপরেই প্রশ্ন হয়েছে 'আপনি মানুষ মারতে পারেন?' গল্প-কথকের মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে বলেছেন, 'ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি হোপলেস, আই পিটি ইউ।' সামন্ততান্ত্রিক

মেজাজ মর্জি, আদব-কায়দার ধরন যে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিপরীত-তা যেন রাজাবাহাদুর-এর মধ্যেই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন অতিথি-আপ্যায়নের জন্য যেটুকু নিজের আভিজাত্য হতে নেমে এসেছিলেন, তা যেন অন্তর্হিত। আবার তিনি ফিরে যাচ্ছেন তার মহিমাময় মর্যাদায়।

প্রথম রাত্রির শিকার অভিযান ব্যর্থ। রাজাবাহাদুরের কণ্ঠে বিরক্তি, শেষমেশ একটা হায়নাকে গুলি করে মেরে তবে তার শান্তি। ভাবটা যেন এই রকমই যে, রাজাবাহাদুর হাতে রাইফেল ধরলে একটাকেও অন্তত প্রাণ দিয়ে সম্মান রক্ষা করতে হবে। পর-পর আরো দুটো রাত কেটে যায়। রাজাবাহাদুরের চরম বিরক্ত,তার সম্মান-রক্ষা করতে কোনো হিংস্র প্রাণীই এগিয়ে আসেনি। অবশেষে এল সেই ভয়ঙ্কর রাত রাজাবাহাদুরের মাছ ধরার রাত। মধ্য রাতে রাজাবাহাদুর গল্প-কথককে নিয়ে এলেন সাঁকের উপর। সেখানে দুটো চেয়ার পাতা। রক্ষীরা কপিকলের সাহায্যে কি যেন নামিয়ে দিচ্ছে নীচে নুড়ির উপর। প্রশ্ন করে জানা গেল, ওটা মাছের টোপ। এরপর অনন্ত প্রতীক্ষা। হঠাৎ গর্জে উঠল রাজাবাহাদুরের রাইফেল এবং পরক্ষণেই অতিকায় ব্যাঘ্রের মরণ-আর্তনাদ। রহস্যের সমাধান তখনও হয়নি, হল একটু পরেই। শিশু গোঙানি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই গল্প-কথক চেঁচিয়ে উঠলেন। রাজাবাহাদুরের রাইফেলের নল সোজা গল্পকথকের বুকে। ততক্ষণে সব বোঝা হয়ে গেছে। হিন্দুস্থানী কী পরের মাতৃহারা একশিশু রাজাবাহাদুরের রাজকীয় মাছ ধরার টোপে পরিণত হয়েছে।

গল্পে মধ্যবিত্ত মেজাজের উদাহরণ সর্বত্রই বিদ্যমান। তবে এ সবের মূল কারণ হল, গল্প-কথক আগাগোড়াই নিজেকে ব্যঙ্গ ও শ্লেষবিদ্ধ করার জন্যই এ ধরনের উক্তি ও সিচুয়েশান সৃষ্টি করেছেন। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে নিজের বৈপরীত্যটাই প্রকাশ পেয়েছে আগাগোড়া শ্লেষের মাধ্যমে। যে আদিমগন্ধী প্রবণতার মধ্যে আটমাস আগে রাজাবাহাদুর বাঘ মেরেছিলেন, এতদিন পরে তা স্মৃতি। কিন্তু বাঘের চামড়ার চটি জ্বলন্ত বাস্তব। এই চটির আরামপ্রদ আমেজে মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতার গল্প-কথক পুরানো নৃশংস অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যেতে চান, এটাই মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদ।

গল্প-কথক মূলত একজন প্রকৃতি প্রেমিক এবং আত্মসচেতন ও বিনয়ী সৌজন্যবোধের প্রকাশ ভঙ্গীই অনেক ক্ষেত্রে তার ভীরুতা ও অসঙ্গতির উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এ গল্পের মূল উদ্দেশ্য খেয়ালী, বিলাসী এবং মেজাজী সামন্ততন্ত্রের রূপটিকে ফুটিয়ে তোলা। চরিত্রগত বৈপরীত্য সৃজনের দ্বারা উদ্দেশ্যটিকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। রাজাবাহাদুরের চরিত্র মাহাত্মো খেয়ালীপনা ও মেজাজী ভাবটিকে সযত্নে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি যে রাজা সেকথা তিনি একবারও ভোলেননি। দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর- শ্রেণী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাজাবাহাদুরের কথায়- 'আচ্ছা বলতে পারেন, আপনি রাজা নন কেন?' এরপরেই জিজ্ঞাসা করেছেন 'আপনি মানুষ মারতে পারেন?' অর্থাৎ, রাজা হতে গেলে মানুষ মারতে পারার ক্ষমতাটা একটা কোয়ালিফিকেশান। সেটা নেই বলে মধ্যবিত্তের প্রতি রাজাবাহাদুরের রয়েছে অনুকম্পা।

গল্পে উল্লেখিত নিম্নবিত্তরা সর্বহারা। রাজঅনুকম্পা পায়নি, পেয়েছে মধ্যবিত্ত গল্প-কথক। ঐশ্বর্যভোগ যত না গর্ব, বেশী পরিতৃপ্তি তা প্রদর্শনে। গল্প-কথককে শিকার চাতুর্য দেখানোর জন্যে টেনে আনা হয়েছে হান্টিং-সেন্টারে। আতিথেয়তা, উপহার-প্রদান সব-কিছুর মধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক দম্ভ থেকে গেছে। গল্প-কথক স্তাবকের ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকেই রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছে। জুতা পাঠানোর মধ্যেও সেই স্তাবকের প্রতি অনুকম্পাই প্রাধান্য পেয়েছে।

'টোপ' গল্পের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি হয়েছে একেবারে শেষের দিকে যেখানে গল্প-কথক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নীচের অন্ধকারে নামিয়ে দেওয়া পুঁটলিটার দিকে–

"পুটলিটা যেন জীবন্ত অথচ কি জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ। কিন্তু কি এ মাছ-এ কিসের টোপ?"

গল্প-কথক রুদ্ধশ্বাস,দ্বিধায় জর্জরিত। তাই কথক চিৎকার করে বলে ওঠে –

" রাজাবাহাদুর, কিসের টোপ আপনার। কি দিয়ে আপনি মাছ ধরলেন?"

আর তখনই রাজাবাহাদুর কালো রাইফেলের নল কথকের বুকে ঠেকালেন রাজাবাহাদুর।

গল্পের সমাপ্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে কোনো নাটকীয় বিচার বা নৈতিক ভাষণ নেই। বরং একটি নিঃশব্দ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে গল্প শেষ হয়। এই সমাপ্তি পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে—আমরা কি নিজেরাও প্রতিদিন কোনো না কোনো 'টোপ' এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না? লেখক সরাসরি কোনো শিক্ষা দেন না, কিন্তু গল্পের অভিজ্ঞতা থেকেই পাঠক নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য হয়।

'টোপ' ব্যঞ্জনাগর্ভ শিরোনাম। শিকারের সময় কোনো জন্তুকেই টোপরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ গল্পে মানবশিশু টোপরূপে ব্যবহাত হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বিলাসী খেয়ালের, অমানবিক আচরণের এক-প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রয়্যাল বেঙ্গলের মত হিংস্র প্রাণীকে বধ করার পিছনে রাজকীয় ক্ষমতার যে দম্ভ বর্তমান, সাধারণ শিকারীর মত জন্তুকে টোপরূপে ব্যবহার না করে মানব শিশুকে ব্যবহার করার মধ্যেও সেই একই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। পরিণামী ভাব-ব্যঞ্জনা 'টোপ' নামকরণটি সেদিক থেকে সার্থক।

'টোপ' গল্পের মাধ্যমে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা ও সমাজের বাস্তব রূপকে একসূত্রে গেঁথেছেন। এটি কেবল একটি ব্যক্তির গল্প নয়; এটি একটি সময়ের, একটি সমাজের গল্প। এখানে দেখানো হয়েছে, কীভাবে সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে আপস করতে করতে নিজের অজান্তেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। গল্পটিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সামাজিক বাস্তবতা ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা একসঙ্গে মিশে গেছে। গল্পটি পাঠককে শুধু আনন্দ দেয় না, বরং আত্মসমালোচনার সুযোগ করে দেয়।